বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রাজনীতি প্রসঙ্গে

এবনে গোলাম সামাদ

বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রভাবিত করে। সব দেশেই করে। আমাদের দেশেও করেছে এবং করছে। বিলাতের মতো দেশে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সময় ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেতে হয়েছে যুদ্ধে। ঘটেছে অনেক মেধাবী ছাত্রের মৃত্যু। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা ভাবের আদান-প্রদান চলে। বিভিন্ন আদর্শবাদ আলোচিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তাই নানা আদর্শের আলোড়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক। এ-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজনীতিতে বহু অবদান রেখেছেন। যা আজ আমাদের ইতিহাসের অংশ। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এর ভাস্বর দৃষ্টান্ত। অন্য সব দেশে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের ব্যবধান বেশী। শিক্ষিত মানুষের এক অংশ যুক্ত হন রাজনীতিতে। যাদের আমরা সাধারণভাবে বলি ইনটেলিজেনশিয়া তারা শিক্ষিত সমাজের সেই অংশ, যারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং সমাজ সংস্কারে অংশগ্রহণে ব্রতী হন। এই উপমহাদেশে ইনটেলিজেনশিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে পালন করছে বিশেষ ভূমিকা। ভাবলোকে তারা সৃষ্টি করেছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্র। সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সামাজিক আশ্লেষনী। সকলে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করলেও আমাদের সমাজ-ইতিহাসে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল এবং হয়ে আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ দেশে শিক্ষার হার এখনো দুঃখজনকভাবেই স্বল্প। আমার ছাত্র জীবনে আমি রাজনীতিমুখর ঠিক ছিলাম না। তবে না না রাজনৈতিক মতবাদ আমাকেও করেছিল প্রভাবিত। কেবল লেখাপড়া শিখে বড় চাকরির অভিলাষ মনকে পরিচালিত করেনি, ভেবেছি দেশ ও দশের সমস্যা নিয়ে। হতে পারে, সে ভাবনার মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা ছিল না। কিন্তু তবু ভেবেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর একশ্রেণীর অধ্যাপকের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হলাম, যে সম্বন্ধে আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। যাকে চিহ্নিত করা চলে 'চাকরির পলিটিক্স' হিসেবে এর লক্ষ্য দেশ ও দশ নয়। সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যা নয়। যাকে বলে চাকরির পলিটিক্স, তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য অধ্যাপকদের কৌশলে টপকে প্রফেসর হওয়া। দল করে সেমিস্টার ও সিন্ডিকেটের সদস্য হওয়া ও সেই সুবাদে কিছু আর্থিক সুযোগ পাওয়া এবং অন্যের ওপর প্রভাব খাটাতে পারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করা। সর্বোপরি, সম্ভব হলে ভাইস চ্যান্সেলর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। যখন প্রথম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন শিক্ষকদের এই রাজনীতি ছিল কেবল শিক্ষকদের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু এখন শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্ররাও জড়িত হয়ে পড়ছেন রাজনীতিতে। এ রাজনীতি দেশের রাজনীতি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ রাজনীতি। কেবলই একশ্রেণীর হাতে গোনা অধ্যাপকের ক্ষমতার লড়াই।

আগে ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ নিতেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে। কিন্তু এখন ছাত্র রাজনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে অনেক রাজনৈতিক দল। ছাত্রদের হুমকিতে মাথানত করে চলতে হয় মূল রাজনৈতিক দলের নেতাদের। আগে ছাত্র রাজনীতিতে গুন্ডামী ছিল না। কিন্তু আইউব আমল থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে পেশীশক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এখন তা লাভ করেছে ভয়াবহ রূপ।

ছাত্রদের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে মারামারিতে খুন হয় ছাত্র। কেবল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মারামারিতেই যে খুন হয় ছাত্র তা নয়, উপদলীয় কোন্দলেও খুনখারাবি ঘটে যথেষ্ট। শিক্ষকরা ছাত্র নিয়ে দল করেন। ছাত্রদের জোরে তারা চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি। এর ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকছে না। হয়ে উঠছে দলীয়, উপদলীয় ও শিক্ষকদের চাকরির পলিটিক্স-এর আখড়া।

আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলি। কিন্তু যারা ছাত্রদের লেখাপড়া শিখাবেন, তারা যদি এরকমভাবে রাজনীতিতে অর্থাৎ ক্ষমতার লড়াইয়ে মেতে থাকেন, তবে কেবল পাঠ্যক্রম বদলিয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যাবে না। আমাদের শিক্ষার সমস্যা কেবল কি পড়াব, কিভাবে পড়াব এবং ছাত্রদের যা শেখাচ্ছি তা শিখছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখবার সমস্যা নয়। যারা শিক্ষকতা করছেন, তারা শিক্ষকতা করবার কতটা যোগ্য এবং তারা শিক্ষকতা আদৌ করছেন কি-না সেটাও ভেবে দেখবারই বিষয়। অনেকে এখনো বলে থাকেন, এটা ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা পিছিয়ে আছি। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, ইংরেজ আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আজকের তুলনায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ ও পরিবেশ অনেক অনুকূল ছিল। ইংরেজ আমলের ম্যাট্রিক পাস করলে অফিস চালাতে পারতো। কিন্তু এখনকার এমএ পাস কেরানীরা তা ঠিক পারছেন না। শিক্ষার একটা লক্ষ্য সব সময়েই থাকবে দফতর পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু তা আজ হচ্ছে না। আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতার মান উন্নত হচ্ছে না, বরং নিম্নগামী হচ্ছে। এর কারণ উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হবার পরিবেশের অভাব।

একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, অনুন্নত দেশে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ শিক্ষার অভাব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন চাকরি করে আমার এখন মনে হয়, এই যুক্তি আদৌ যথেষ্ট নয়। আসলে গণতন্ত্র একটা অভ্যাস। যা গণতন্ত্র চর্চা করেই অর্জন করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে সংঘাত হতে দেখা যাচ্ছে বেশি। ক'দিন আগের ঘটনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচন হলো। এই নির্বাচনে হারলো বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের দল। আইন অনুসারে, পুরাতন সিন্ডিকেটের ছিলো আরো কিছু দিন (২২ জানুয়ারী পর্যন্ত) কাজ চালানোর কথা। কিন্তু একদল শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে ঢুকে শুরু করলেন হাতাহাতি। এ সময় চলছিলো কোনো এক বিভাগে নতুন একজন শিক্ষক নিয়োগদানের জন্যে সাক্ষাৎকার। সেটা হতে পারলো না। শিক্ষকদের দাবী হলো, নতুন সিন্ডিকেট সদস্যরা আসন গ্রহণ করবার পর করতে হবে সব নিয়োগ সম্পর্কিত সভা। এটা কোনো বিধানে পড়ে না। কিন্তু তবু সেটাই গায়ের জোরে দাবী করে বসলেন কিছু অধ্যাপক। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলো না। দু'টি ছাত্র সংগঠনের কথিত ছাত্রদের মধ্যে শুরু হলো মার-দাঙ্গা। বন্ধ হয়ে গেল প্রশাসন ভবন। ছাত্রদের বিভিন্ন পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে যোগ্যতা যাচাই করে নয়, দল বিচার করে। আগে থেকেই ঠিক থাকে, কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করলে তাকে কোনো দল করতে হবে। এরকম দলাদলি চলতে থাকলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া আর বিশেষ হবে না বলেই মনে হয়। এদেশের পত্র-পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের খবর ফলাও করে ছাপা হয়। কিন্তু কোনো শিক্ষক ছাত্রদের কতটা শেখাচ্ছেন, কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রকৃত অধ্যাপনা করছেন তার কোনো মূল্যায়নই এখন আর হয় না। কে আওয়ামী লীগের শিক্ষক, কে বিএনপি'র শিক্ষক আর কে জামায়াতের শিক্ষক এ-সব নিয়েই হয় আলোচনা। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলই দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত করা যায় না। কারণ, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের মূল যুক্তিকেই অস্বীকার করা হয়।

অনেক অধ্যাপক আছেন, যারা আসলে কোনো দল করে না। যে দল যখন দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতায় আসে, নিজেকে তার সমর্থক হিসেবে জাহির করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক'দিন আগেও যেসব অধ্যাপক নিজেদের বিএনপি'র সমর্থক বলে দাবী করতেন, তাদের একটা বড় অংশই এখন আওয়ামী লীগ পন্থী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাতে চাচ্ছেন। শিক্ষকরা আদর্শবাদী রাজনীতি করলে তাদের ওপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা বাড়তে পারে। কিন্তু এরকম দলবাজির রাজনীতি শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেই চলেছে।

সব শিক্ষক রাজনীতি করেন না। অনেকেই থাকতে চান সম্পূর্ণ রাজনীতি থেকে দূরে। কিন্তু শিক্ষদের সাধারণত রাজনীতি, সব শিক্ষককেই করে তুলছে সমালোচনার মুখোমুখি। দেশের সব ক'টি রাজনৈতিক দল বলছেন, তারা সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চায়। কিন্তু চাওয়াটাই কি যথেষ্ট। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্য কেবল যে ছাত্ররা দায়ী তা নয়, শিক্ষকরাও দায়ী। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারবে না। দেশের রাজনীতি এক জিনিস, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ রাজনীতি এক জিনিস নয়। দেশের ক্ষেত্রে রাজনীতি আছে আর থাকবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজি বন্ধ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ভাল-মন্দের মধ্যে তফাৎ অনেকটাই পরিমাণগত। মাত্রা ছাড়া রাজনীতি কোনো দেশের জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। ক্ষমতার লড়াইয়েও একটা পর্যায়ের পর অবাঞ্ছিত হয়েই পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ছাত্রদের লেখাপড়া শেখাবেন না, কেবল রাজনীতি করবেন, তা হতে পারে না।

আমি আমার অধ্যাপনা জীবনে ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হতে দেখেছি, রাজনৈতিক দলগত কারণে। চোখের ওপর ছাত্র মরতেও দেখেছি। কিন্তু এখন দেখছি, ছাত্রদের সম্মুখে শিক্ষকদের মারামারি করতে। এক জীবনেই অনেক পরিবর্তন দেখলাম। যা দেখতে চাইনি কখনো। এরকম মার-দাঙ্গার রাজনীতিকে অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সমর্থন করা যায় না।

অনেক অধ্যাপক আছেন, যারা আসলে কোনো দল করে না। যে দল যখন দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতায় আসে, নিজেকে তার সমর্থক হিসেবে জাহির করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক'দিন আগেও যেসব অধ্যাপক নিজেদের বিএনপি'র সমর্থক বলে দাবী করতেন, তাদের একটা বড় অংশই এখন আওয়ামী লীগ পন্থী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাতে চাচ্ছেন। শিক্ষকরা আদর্শবাদী রাজনীতি করলে তাদের ওপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা বাড়তে পারে। কিন্তু এরকম দলবাজির রাজনীতি শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেই চলেছে।

দৈনিক ইনকিলাব